মতামত,
দি ডেইলি স্টার, মার্চ ২১, ২০২৪

রাবার চাষে প্রাকৃতিক বনের মৃত্যু

প্রাকৃতিক রাবারের বিকল্প আছে এবং আমাদের কৌশল হওয়া উচিত আর রাবার চাষ না বাড়ানো। সরকার যেখানে সম্ভব রাবারের পরিবর্তে স্থানীয় প্রজাতি লাগানোর কথাও চিন্তা করতে পারে।

বান্দরবানে পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল পরিষ্কার করে রাবার চাষের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। ছবি: ফিলিপ গাইন

ফিলিপ গাইন

২০২৪ সালের ২ মার্চ। মধুপুর শালবনে প্রকৃতির সম্পূর্ণ ধ্বংসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। প্রায় ৩০ বছর আগে রোপণ করা একটি মাত্র গাছ—রাবারের মনোকালচার, প্রতিদিন শয়ে শয়ে কাটা হচ্ছে। গাছ কাটার পর সেগুলো টুকরো টুকরো করে ট্রাকে তোলা হচ্ছে এবং দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জ্বালানি, বোর্ড তৈরি, ইট পোড়ানো ও অন্যান্য কিছু কাজে ব্যবহার হবে এ কাঠ। যা থাকছে তা হলো মোথা, যা শিগগিরই দ্বিতীয় আবর্তের রাবার চাষের জন্য উপড়ে ফেলা হবে। রাবারের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বছর ধরে এখানে চাষ হবে আনারস ও অন্যান্য ফসল।

মধুপুর শালবনের মাঝে সন্তোষপুর ও পীরগাছা রাবার বাগানে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কাটা হচ্ছে রাবার গাছ। রাবার এমন একটি বিদেশি গাছ, যা আমাজন রেইনফরেস্ট থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে। যদি রাবার কষের জন্য বাণিজ্যিকভাবে রাবার গাছ রোপণ করা হয়, তবে সাধারণত ৩০ থেকে ৩৫ বছর শেষে তা কেটে ফেলতে হবে। একটি রাবার গাছ প্রায় ২৬ বছর ধরে কষ দেয় এবং তারপর এটি পুরোনো ও অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ে এবং তখন তা কেটে ফেলা হয়।

টাঙ্গাইল-শেরপুর রাবার জোনের পাঁচটি বাগানের মধ্যে দুটিতে রাবার কাটার কাজ শুরু হয়েছিল গত বছর, যখন সন্তোষপুওে ৫৫ একর জমির নয় হাজার ও পীরগাছা রাবার বাগানের ৫৫ একর জমির সাত হাজার রাবার গাছ কাটা হয়।

এরপর বাগান দুটির প্রতিটিতে ১২ হাজার ৩৭৫টি রাবারের চারা রোপণ করা হয়। রাবারের চারাসহ জমি লিজ নিয়ে এখানে চাষ হচ্ছে আনারস ও অন্যান্য ফসল।

এ বছর পীরগাছা রাবার বাগানের ১৫০ একর জমি থেকে ১৩ হাজার ৫৬৪টি ও সন্তোষপুর রাবার বাগানের ১৫০ একর জমি থেকে ২৫ হাজার ৯০০টি রাবার গাছ কাটার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে।

মধুপুর-শেরপুর জোনে আট হাজার ১২৮ একর বনভূমিতে বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফআইডিসি) ব্যবস্থাপনায় পাঁচটি রাবার বাগান রয়েছে এবং অন্যান্য এলাকায় আছে আরও ১৪টি রাবার বাগান। এই পাঁচটি বাগানের মধ্যে চারটি মধুপুর শালবনের সাত হাজার ৫০৩ একর এলাকাজুড়ে।

২০২৪ সালে পীরগাছা রাবার বাগানের অনুৎপাদনশীল রাবার গাছ কাটা হয়। ছবি: ফিলিপ গাইন

মধুপুর শালবনে প্রথম রাবার গাছ লাগানো হয় ১৯৮৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাবার চাষ উদ্বোধন করতে হেলিকপ্টারে করে মধুপুরে যান। তিনিই মধুপুরে প্রথম রাবার গাছটি রোপণ করেন। এ এলাকার সব রাবার গাছ কাটা হলেও এ গাছটিকে সাজিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফআইডিসি) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মধুপুরে প্রথম গাছ লাগানোর পর থেকে এ জোনের পাঁচটি বাগানে প্রায় ২০ লাখের মতো রাবারের চারা রোপণ করা হয়।

বাংলাদেশ বন বিভাগ রাবার চাষের জন্য বিএফআইডিসিকে বনভূমি হস্তান্তর করেছে। উভয়ই রাষ্ট্রীয় সংস্থাড়একটির কাজ বন রক্ষা করা এবং অন্যটির কাজ বনজ সম্পদ আহরণ ও রাবারসহ বাণিজ্যিক বৃক্ষ চাষ করা। বিএফআইডিসি রাবার চাষের শুরুতে যে কাজটি করে তা হলো, বনভূমির সব প্রাকৃতিক উদ্ভিদড়গাছ, লতাগুল্ম ও বনতলড়পরিষ্কার করে যা বন্যপ্রাণী, পাখি, কীটপতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া ও বিভিন্ন ধরনের প্রাণের আশ্রয়স্থল।

সন্তোষপুরে রাবার বাগান করার আগে এখানটায় করা হয়েছিল সেগুন গাছের বাগান। সেগুন চাষের ঠিক আগে এখানে ছিল প্রাকৃতিক শাল বন। মহিষমারা গ্রামের হাসমত আলী, যার বয়স আশির কোঠায়, এখন অসহায় দৃষ্টিতে তার গ্রামের কাছাকাছি রাবার গাছ কাটা দেখছেন। মহিষমারা গ্রামটি 'গজারিচালা' নামেও পরিচিত (গজারি মানে শাল ও চালা মানে উঁচু জমি)। সেগুন চাষের আগে এখানে যে ঘন শালবন ছিল, তার একজন সাক্ষী তিনি।

‘স্বাধীনতা যুদ্ধের ২০ বছর আগে যখন আমি আমার পরিবারের সঙ্গে এখানে আসি, তখন এই এলাকায় ঘন শাল বন ছিল’, বলেন হাসমত আলী। ‘আমি বনে বাঘ, ভালুক ও হরিণ দেখেছি। বাঘের হাত থেকে গরু রক্ষা করতে আমাদেরকে সব সময় সতর্ক থাকতে হতো। তারপর দেখলাম শালবন নিলামে বিক্রি করে সেগুন লাগাতে। এরপর এরশাদের আমলে চাষ করা হলো রাবার গাছ।’

১৯৮৬ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ যে রাবার গাছটি লাগিয়েছিলেন। ছবি: ফিলিপ গাইন

পার্বত্য চট্টগ্রামের (সিএইচটি) রাবার চাষের সূত্র ধরে মধুপুরে এসেছে ভিনদেশি এ বৃক্ষটি। পার্বত্য চট্টগ্রামে রাবার চাষের জন্য অন্যান্যদের মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে অর্থ পাওয়া গেলেও মধুপুরে প্রথম রাবার প্রকল্পের অর্থায়ন সরকার নিজেই করেছে।

১৯৮০-র দশকের শেষদিকে মধুপুর ও দেশের অন্যান্য অংশে দ্বিতীয় রাবার উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য এডিবি আনুষ্ঠানিকতা প্রায় সম্পন্ন করে এনেছিল। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হয়েছিল এবং তহবিল প্রায় পাইপলাইনে চলে এসেছিল। কিন্তু বিভিন্ন মহলের তীব্র সমালোচনার মুখে, স্থানীয় প্রতিরোধ ও জাতীয় সংবাদমাধ্যমে এই লেখকের ক্রমাগত রিপোর্টিংয়ের ফলে শেষ পর্যন্ত এডিবি এ প্রকল্পে আর অর্থায়ন করেনি।

দ্বিতীয় রাবার উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ না হলে আরও ১৫ হাজার একর বনভূমিতে রাবার চাষ হতো, যা আরও বনবিনাশ ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও সংঘাতের কারণ হতো। প্রথম রাবার প্রকল্প ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভমি ও জীবন-জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব

মধুপুরে রাবার চাষের কারণে গারোসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠী নাটকীয়ভাবে বনজ সম্পদে তাদের ভাগ ও গবাদি পশুর চারণভূমি হারিয়েছে। রাবার বাগান হলো মনোকালচার ও এর তলায় কিছুই জন্মায় না। দূর থেকে দেখতে সবুজ মনে হলেও এটি আসলে বন্য প্রাণীবিহীন সবুজ মরুভূমি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাতা ঝরে পড়লে তা সম্পূর্ণ পোড়া ও অনুর্বর দৃশ্য ধারণ করে। এটি প্রাকৃতিক বনের ঠিক বিপরীত চিত্র।

রাবার চাষের পরিবেশগত পরিণতি ও স্থানীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব বিবেচনায় নিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে এর কাহিনী কোনো সুসংবাদ বয়ে আনেনি।

আমাজনের আদিবাসীরা রাবার গাছকে বলেন 'কাওটচৌচ', যার অর্থ 'যে গাছ কাঁদে'। ছবি: ফিলিপ গাইন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের তথ্যমতে, এখন পর্যন্ত প্রায় এক লাখ ৪০ হাজার একর জমি রাবার চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এই জমির বেশিরভাগই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভূমি। পাকিস্তান আমলে ছোট পরিসরে রাবার চাষ শুরু হয়। কিন্তু লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচএম এরশাদের সময় রাবারের ব্যাপক বাণিজ্যিক চাষ হয়। রাবার বাগানের মালিকদের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় সংস্থা যেমন: বিএফআইডিসি, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, তেমনি রয়েছে চা বাগান, বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন ও বড়-ছোট ব্যক্তি মালিক।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক ও অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাবার চাষ হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। এখানে রাবার বাগানের মালিক ব্যক্তি, কিন্তু যে জমিতে এ ধরনের রাবার চাষ হয়েছে, তার বেশিরভাগ এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সনাতনী ভূমি।

ব্যক্তি মালিকানাধীন রাবার চাষ বান্দরবান পার্বত্য জেলার লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান সদর ও আলীকদম উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকার পাহাড়ে ব্যাপক পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এ জেলায় বাণিজ্যিক রাবার চাষ ও হর্টিকালচারের জন্য ৪৫ হাজার একর সরকারি জমি লিজ দেওয়া হয়েছে। এক হাজার ৮০০ প্লটের একেকটির আয়তন ২৫ একর। একটি সরকারি নথিতে এক হাজার ৬৩৫ জন ব্যক্তি এবং কোম্পানির তালিকা পাওয়া যায়, যারা এই চারটি উপজেলায় রাবার ও হর্টিকালচারের জন্য এসব প্লটে পেয়েছে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে এসব প্লটের ইজারা দেওয়া হয়। তালিকাটি গুরুতর অনিয়ম ও ন্যক্কারজনক সরকারি কৌশল উন্মোচন করেছে। এক হাজার ৬৩৫ ব্যক্তি, স্বত্বাধিকারী ও কোম্পানি যারা রাবার ও হর্টিকালচারের জন্য প্লট পেয়েছে, তাদের মধ্যে মাত্র ৩২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সদস্য। বাকিদের বেশিরভাগই পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের অন্যান্য জেলার বাঙালি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান বলেন, 'রাবার বাগান যেখানে করা হয়েছে, সেখানকার প্রাকৃতিক বন সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় রাবার চাষ পার্বত্য চট্টগ্রামে সফল হয়নি। রাবার মনোকালচার পরিবেশ, প্রতিবেশ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের জন্য বিপর্যয়কর প্রমাণিত হয়েছে। যে জমিতে ঐতিহ্যগতভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা জুম চাষ করতেন ও ফসল ফলাতেন, তার অনেক জায়গা থেকে রাবারের কারণে তারা উচ্ছেদ হয়েছেন।'

অনুৎপাদনশীল পীরগাছা রাবার বাগান (২০১৮)। ছবি: ফিলিপ গাইন

রাবার: একটি ঔপনিবেশিক প্রকল্প

চা বাগান ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, চা উৎপাদনের জন্য ইজারা নেওয়া জমিতে রাবার চাষ লাভজনক হয়নি। এখন রাবার গাছ অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ছে। এসব গাছ কাটার পর এ জমির ব্যবহার কীভাবে হবে, তা এখনো বলা যাচ্ছে না।

রাবার গাছের দুধ-রঙের কষ একটি আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক দ্রব্য, যা আমরা পাই রাবার গাছ বা 'হাভিয়া ব্রাজিলিয়েনসিস' থেকে। এটি আমাজন রেইনফরেস্টের একটি বৃক্ষ। ১৪৯৩ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস এ গাছটি ইউরোপে আনার আগে গাছটি ইউরোপ, এশিয়াসহ আরও অনেক জায়গায় অজানা ছিল। কলম্বাস গাছটিকে বলতেন, 'কাওটচৌচ'। এটি আমাজন জঙ্গলের আদিবাসীদের একটি শব্দ, যার অর্থ 'যে গাছ কাঁদে'।

এশিয়াতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা গাছটি প্রথমে আনে শ্রীলঙ্কায়, তারপর মালয় ও কালক্রমে এটি বাংলাদেশেও পৌঁছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক রাবার এখন এশিয়াতে উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের এক সময় মানুষ প্রাকৃতিক রাবার থেকে তৈরি পণ্য ছাড়া জীবন ভাবতে পারত না। উড়োজাহাজের কথা ভাবুন। রাবারের তৈরি চাকা ছাড়া ১৯০৩ সালে এটি কি আকাশে উড়তে পারত? মোটরগাড়ি, বাই-সাইকেল ও অন্যান্য যানবাহনের চাকা কি রাবার ছাড়া বানানো সম্ভব ছিল? ১৯৩১ সালে কৃত্রিম রাবার আবিষ্কারের পরও গাড়ির চাকা ও হাজারো পণ্যে প্রাকৃতিক রাবারের ব্যবহার অব্যাহত আছে। রাবার থেকে তৈরি পণ্য আমাদের জীবন সহজ ও আরামদায়ক করে দিয়েছে। রাবার নিঃসন্দেহে এমন একটি উদ্ভিদ, যা মানুষকে অনেক সমৃদ্ধি দিয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধি আবিষ্কার চিনকোনা হলে, রাবার হলো সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পজাত পণ্য। চিনকোনা আমাদের ম্যালেরিয়া থেকে সুরক্ষার জন্য কুইনাইন দিয়েছে, আর রাবার বিশ্বকে দিয়েছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। একসময় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অর্থনীতির মেরুদন্ড হয়ে উঠেছিল ব্রাজিলিয়ান রাবার।

যাইহোক, যে বৃক্ষ মানুষকে এত সমৃদ্ধি দিয়েছে, সেই বৃক্ষই অন্য শত প্রজাতির বৃক্ষ ও প্রাণীকুলের জন্য মৃত্যুদন্ডের অন্যতম কারণ হিসেবে হাজির হতে পারে।

সন্তোষপুর রাবার বাগানের রাবার গাছ কাটা হচ্ছে। মার্চ ২০২৪। ছবি: ফিলিপ গাইন

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা রাবার গাছের ছাল কেটে সাদা কষ বের করত। খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে লাতিন আমেরিকায় রাবারের ব্যবহার ছিল। ওলমেক সভ্যতার সময় 'রাবার মানুষ' হিসেবে পরিচিত জাতি ছিল, যারা খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ পর্যন্ত মেক্সিকোতে বসবাস করত।

ইউরোপীয়রা এল দোরাদো (সোনার শহর) ও খনিজ সম্পদের সন্ধানে বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে আমেরিকাতে হানা দিতে শুরু করে। তারা শহরের পর শহর লুণ্ঠন এবং স্থানীয় সভ্যতা ও আদিবাসীদের ধর্মের সব নিদর্শন ধ্বংস করে কিছু সোনা ও রূপা (আমেরিকার আদিবাসীদের কাছে যা যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্র) পায় বটে, কিন্তু তারা আরও মূল্যবান জিনিস খুঁজে পায়ড়উদ্ভিদড়রাবার যার মধ্যে অন্যতম। একবার ভাবুন আমাদের আধুনিক খাদ্য তালিকায় আলু, টমেটো, মরিচ ও কাসাভা নেই! এসবই এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। খনিজ সম্পদ এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু উদ্ভিদ শেষ হয় না। কারণ সেগুলোর উৎপাদন ও পুনরায় উৎপাদন চলতে থাকে।

রাবার ও এসব উদ্ভিদ, যা ইউরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এনেছিল, আমাদের জীবন চিরতরে বদলে দিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা দখল ও শোষণ থেকে ইউরোপীয় এবং উপনিবেশবাদীরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে ঔপনিবেশিকতার অবসান হয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক লুটপাট বন্ধ হয়নি। রাবার এখনো সচ্ছল ব্যক্তিদের কিছু সমৃদ্ধি দিচ্ছে বটে, তবে তা হচ্ছে চরম পরিবেশগত ক্ষতি ও বনে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর দুর্দশার বিনিময়ে।

রাবার চাষ—হোক তা পার্বত্য চট্টগ্রাম, মধুপুর বা চা বাগানে—রাষ্ট্র ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা হয়তো এনে দিয়েছে, কিন্তু রাবার চাষের জমি একসময় যারা সনাতনী অধিকার বলে ব্যবহার করতেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সবথেকে খারাপ যা হয়েছে তা হলো, যেখানেই রাবার চাষ হয়েছে, সেখান থেকেই প্রাকৃতিক প্রাণসম্পদ হারিয়ে গেছে। একবার ভাবুন আগামী এক দশকের মধ্যে প্রথম আবর্তে লাগানো সব রাবার গাছ কাটা হবে এবং সেখানে লাগানো হবে দ্বিতীয় আবর্তের রাবার চারা। এর অর্থ তিন-চার দশক আগে যেখানে প্রাকৃতিক অরণ্য ছিল, তা চিরতরে হারিয়ে যাবে। আর এভাবেই প্রাকৃতিক রাবার হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক অরণ্যের জন্য মৃত্যুদন্ড। প্রাকৃতিক রাবারের বিকল্প আছে এবং আমাদের কৌশল হওয়া উচিত আর রাবার চাষ না বাড়ানো। সরকার যেখানে সম্ভব রাবারের পরিবর্তে স্থানীয় প্রজাতি লাগানোর কথাও চিন্তা করতে পারে।

ফিলিপ গাইন: গবেষক ও সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউমেন ডেভেলপমেন্টের (সেড) পরিচালক

মধুপুর থেকে প্রবীণ চিসিম ও সেড স্টাফ সিলভেস্টার টুডু লেখককে মাঠ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন।

https://bangla.thedailystar.net/opinion/views/news-569141